বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও নেত্রী শেখ হাসিনা:অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা

*মুহম্মদ মাহবুব আলী**

**মুহম্মদ* মাহবুবআলীঅর্থনীতিবিভাগেরঅধ্যাপক, ঢাকাস্কুলঅবইকোনোমিক্সএবংপ্রেসিডেন্সিবিশ্ববিদ্যালয়েরসাবেকউপাচার্য

বাঙালি জাতির নয়নের মণি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান । যখন ব্রিটিশরা ইচ্ছা করেই দ্বি-জাতি তত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করল; তখন থেকেই শেখ মুজিব তার সব সত্তা দিয়ে বাঙালি জাতির অগ্রউন্নয়ন ও মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্র গঠনে তৎপর হলেন। সারা জীবন তিনি গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক ছিলেন। পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় ঘোষণা দেনও উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা । সাথে সাথে বাঙালিরা এ ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের সময় জেলে থেকেও তিনি নিজেকে প্রমাণিত করেছেন একজন দক্ষ কাণ্ডারি কিভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

লাহোর প্রস্তাব-১৯৪০ সালে   ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলোতে মুসলমান বেশি, সে দুটি অঞ্চলকে নিয়ে দুটি দেশ এবং বাকি অঞ্চলটিকে নিয়ে আর একটি দেশ তৈরি করা হবে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলমানরা বেশি সে এলাকা দুটি নিয়ে দুটি ভিন্ন দেশ না হয়ে পাকিস্তান নামে একটি দেশ হলো এবং ১৫ আগস্ট বাকি অঞ্চলটি ভারত নামে অন্য একটি দেশে ভাগ করে দেয়া হলো ।পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ ছিল শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ ।

বাজেটের ৭৫% ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে, ২৫% ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে, যদিও পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় ছিল বেশি, শতকরা ৬২ ভাগ ।পূর্ব পাকিস্তান চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয় ।

আবার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা পেশ করেন-পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সবকরম অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ন থেকে মুক্তির এক অসাধারণ দলিল-সেগুলো পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের একান্ত অনুসারীদের বুক রক্তাক্ত করে ।

কেননা তারা বুঝতে পারে যে, বঙ্গবন্ধু দক্ষ নেতৃত্বগুণে কেবল এগিয়ে চলেছেন তা নয় বরং বাঙালি জাতির ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন । ১১ দফা সমর্থন করে তিনি প্রমাণ করেন যে, বাঙালিদের অন্য-উন্নয়নের বিকল্প কিছু তার কাছে নেই । আগরতলা যড়যন্ত্রের মিথ্যা মামলায় তিনি অবিচল থেকেছেন । সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমারা তাকে ভয় করতো । অথচ গণতন্ত্রের একজন উদগ্র সমর্থককে তারা কোনোমতেই প্রধানমন্ত্রীর আসন দিলেন না ।পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত ছিল ।অবশ্য বঙ্গবন্ধুর মূল প্রতিপাদ্য ছিল বাঙালি জাতির উন্নয়ন করা ।**৭ই মার্চের ভাষণকে বলা হয় ম্যাগনাকার্টাঃ**

ভায়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি । আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন । আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে । আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায় । কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন । আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরিকরবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো । এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করূ ণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস । ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস । বাংলার ইতিহাস- এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস । ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি । ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই । ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান মার্শাল ল্ব জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে । ১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে । ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গনতন্ত্র দেবেন - আমরা মেনে নিলাম । তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো । আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি ।

আমি, শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রু য়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন । তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা । তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে । আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো । আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্ত ও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব । জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন । বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে । তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো । তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি । তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা দেয়া হবে । যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে

করাচি পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তি পূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তি পূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কী পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্র"র আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বির দ্ধে- তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুর - আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার কর ন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপরে দিয়েছেন।ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারেনা। এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবী মানতে হবে।

প্রথম, সামরিক আইন- মার্শাল ল্ব উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না। আমি, আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাঁচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেইজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ারগাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে- শুধু... সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় - তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্র র মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু - আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে

মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা। আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমাদের রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। মনে রাখবেন, শত্র বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে অাকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দুমুসলমান, বাঙালী-ননবাঙালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহলায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশালাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা।"

মোবাশ্বের আলীওবাংলাদেশের সন্ধানে গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, বঙ্গবন্ধুর দুর্দমনীয় সাহস, ন্যায়নিষ্ঠা বাঙালি জাতিকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেএকটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। ২৬মার্চ একটি বার্তার আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা জারি করেন। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের অব্যবহিত পর এ ঘোষণাটি ইপিআর-এর নিকট পৌছানো হয় এবং তা ইপিআর বেতারের মাধ্যমে যথাযথভাবেই প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা ছিল নিরূপঃওএটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আহবান, আপনারা যে যেখানেই থাকুন এবং যার যা কিছু আছে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত কর ন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বিতাড়িত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবেএএ ব্যাপারে মোবাশ্বের আলী গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ঘোষণাটি ইপিআর সদস্যের মাধ্যমে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু জেল-জুলুম কোনো কিছুতেই ভয় পাননি। রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও পিলখানা ইপিআর হেড কোয়ার্টার আক্রমণের খবর ও গুলির আওয়াজ পাওয়ার সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাত ১২.০৫ মিঃ থেকে ১২.১৫ মিঃ পর্যন্ত কয়েকবার ওয়ারলেসের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করেও ঘৃণিত ইয়াহিয়া খান বিশ্ব জনমতের কারণে তাকে ফাঁসি দেওয়ার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধুর চিন্তা- চেতনা ও মননজুড়ে সর্বদা উচ্চারিত হয়েছে বাঙালি জাতি যেন ভালো থাকে।

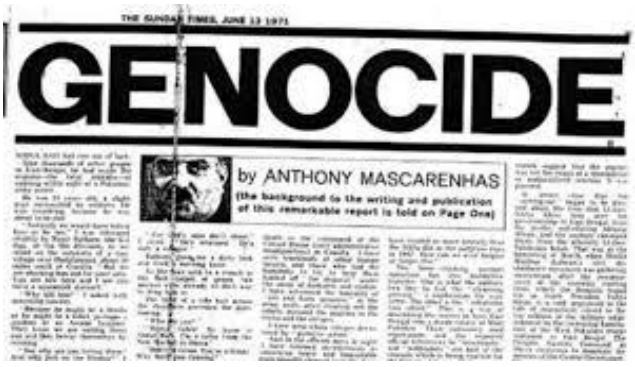

১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে -মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা- বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে শপথ গ্রহণ করে তাদের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ।পাকিস্তানি অপশাসন শোষণ নির্যাতন ও বৈষম্যের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বাঙালি জাতি মরণপণ সংগ্রাম করে ।বাংলাদেশ সাড়ে ৯ মাস লড়াই করে স্বাধীন হলো । পাকিস্তানি ও তাদের এ-দেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদররা এ সময়টায় গোটা দেশকে একটি শ্মশানপুরীতে রূপান্তর করেছিল । ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়েও জলাদরা অট্টহাসিতে বিরাজমান ছিল । দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু ফিরলেন । স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু ওঅস্থায়ী সংবিধান আদেশ্ব জারির মাধ্যমে দেশে বহুদলীয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ।বঙ্গবন্ধু সাড়ে ৭ কোটি জনমানুষ অধ্যুষিত,যুদ্ধ বিধ্বস্ত, শূন্য হাতে দেশ পরিচালনা প্রতিকূলতা এবং বিধ্বস্ত অবস্থার মাঝে কাজ করতে হয় | ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আবার সরকার গঠন করে | সকল প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং বিধ্বস্ত অবস্থার উত্তোরণের জন্য বঙ্গবন্ধু একদলীয় 'বাকশাল' গঠনের সিদ্ধান্ত নেন | এবং দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন । মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন । এখনো যখন বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের কার্যক্রম নিয়ে নির্মোহ গবেষণা করি তখন দেখতে পাই, বঙ্গবন্ধু যে বিশাল কর্মযজ্ঞ বাংলার জনগণের জন্য শুরু করেছিলেন তা বাস্তবায়ন হলে অনেক আগেই বাংলাদেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশ হারে বার্ষিক ভিত্তিতে ছাড়িয়ে

যেত ।বাংলাদেশ যোগ দিয়েছিল কমনওয়েলথে, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছিল, ইসলামিক জোট সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছিল, জোটনিরপে রাষ্ট্রম-লীর দলে যোগ দিয়েছিল ।

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষকে যেমন আপন করে নিয়েছিলেন তেমনি তাদের সন্তান সন্ততিদের প্রতি ছিল তাঁর বুকভরা ভালোবাসা। তিনি জানতেন আজকের শিশু আগামী দিনের পথপ্রদর্শক। বঙ্গবন্ধু তাদের উন্নয়নের জন্য,ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিন পালন করতেন সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরপূর্ণভাবে। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও শিশু-কিশোরদের সময় দিতে পছন্দ করতেন।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির ভাগ্যোন্নয়নে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কখনো পরোয়া করতেন না, তাঁর নিজের ও পরিবারের ক্ষতি হতে পারে। তাঁর কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল,সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারোর সঙ্গে শত্র তা নয়। এই মহতী নেতা শান্তির জন্য জুলিও কুরী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। বাঙালি ছিল তাঁর হৃদয়ের মণি। তাদের উন্নয়নের জন্য একের পর এক কর্মসূচি স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রহণ করেছিলেন। চেষ্টা করছিলেন কেবল যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রটিকে পুনর্গঠন নয় বরং বিভিন্ন ফ্রন্টে দীর্ঘমেয়াদি তৎপরতার আওতায় উন্নয়ন করার ।বিবিসি বাংলা সার্ভিস যখন সর্বকালের সেরা বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করছিলেন সঙ্গতকারণেই বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত হলেন সেরা বাঙালি হিসেবে। এখানেই বঙ্গবন্ধুর জয়। আদর্শিক নির্লোভী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহতীপ্রাণ ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর পরও জনপ্রিয়।

সাড়ে তিন বছর শাসনকালকে অভিহিত করা যায় বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিত্তিভূমি স্থাপন। একদিকে বিদেশ থেকে যারা আমাদের দেশের অবিরাম শত্র তা করে চলেছে আর সে ধর্ম ব্যবসায়ী ও যুদ্ধাপরাধী যারা বাঙালি হয়েও বাঙালি জাতির অগ্রগতিকে বারবার পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করছে। আমাদের বঙ্গবন্ধু ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সবাইকে অর্থনৈতিক মুক্তির রূপরেখা কেবল দেননি,শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা বরং তা যাতে বাস্তবায়িত হয় সে জন্য কৌশলগত ব্যবস্থাপনাকে বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সমুদ্রসম্পদ নিয়ে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দরিদ্রদের জন্য কো- অপারেটিভের ব্যবস্থা করেন। ব্যাংকিং- শিল্প-কল-কারখানায় জাতীয়করণের কোনো বিকল্প ছিল না। দেশের অগ্রগতি ঘটুক, মানুষ স্বাবলম্বী হোক, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠুক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর তার স্থানীয় দোসররা নানা ধরনের অপকর্ম ঘটাতে থাকে। ১৯৭৫ সালের কালরাতে বঙ্গবন্ধু

সপরিবারে নৃশংসভাবে নিহত হন। বিশ্বশান্তি কাউন্সিল তাকে শান্তির জন্য জুলি ও কুরি পদক প্রদান করে।

পঁচাত্তরের পর দীর্ঘকাল বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার আইন করে বন্ধ ঘোষণা করেছিল। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করেছি অনেক শৃঙ্খলিত পরিবেশে। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে যে প্রজন্ম তৈরি হচ্ছিল তা২৯৬-এর আগ পর্যন্ত অনেকখানি দিগ্বদিক শূন্য ছিল। জিয়ার নষ্টামি, এরশাদের কলুষিত রাজনীতিকে বিবেকশূন্য করে তোলে। সমাজে যে শৃঙ্খলা ছিল, বঙ্গবন্ধুর যে মহান আদর্শসমূহ ছিল তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে শাসকগোষ্ঠী থেকে শুরু করে নানামুখী অসৎ পরিকল্পনা, খুনি জিয়াউর রহমান৩মানি ইজ নো প্রবলেম্ব বলে দেশে এক অস্থিতিশীল ও লুটেরা গোষ্ঠীর উৎপাদন করেন। কথায় আছে, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। আর তাই তো জিয়ার দুই পুত্রই আজ মহামূর্খের আসনে বসে আছে, যদিও একজন মারা গেছে। এই লুটেরা গোষ্ঠীটি দেশের খোলনলচে পরিবর্তন করে দিতে চান কিছু অসাধু ব্যক্তির ছত্রচ্ছায়া আর২৭১-এর মানবাধিকার হরণকারী, পরাজিত শক্তি ও ধর্ষণকারীদের সম্মিলিত সহযোগিতায়। ফলে ভোগব্যবস্থায় এক অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। বৈধভাবে সে পদ থেকে তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আর তাই প্রধানমন্ত্রীর অধীন ব্যবস্থায় সরকার জাতীয় সংসদের মাধ্যমে প্রবর্তন করেন। তিনি শত্র দের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন। কখনো তিনি কারোর বির দ্ধে কঠোরতা প্রদর্শন করেননি। তিনি শুধু বাংলাদেশের নেতা নন বরং একজন আন্তর্জাতিক ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভাবতে কষ্ট লাগে বঙ্গবন্ধুর মতো শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিত্বকে নোবেল প্রাইজ দেয়া হয়নি।

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী" মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিক কথা " গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাই নিয়ে লেখালেখি স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। তবে মুক্তিযুদ্ধ একদিনে শুরু হয়ে ৯ মাসের মাথায় শেষ হয়েছে– এ জাতীয় ভাবনাও বাতুলতা মাত্র। যুদ্ধের ৯ মাসের ব্যাপ্তিটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্ব; মুক্তিযুদ্ধ একটি চলমান প্রক্রিয়া, এর সমাপ্তি নেই। দ্বিতীয় পর্বের একটা সূচনা অবশ্যই ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১; কিন্তু তার সমাপ্তি হয়ত জন্ম জন্মান্তরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় পর্বটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন পর্ব। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে আমাদের ব্যক্তিক, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন পর্ব। তা অনন্তকাল চলমান থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস এবং সম্ভবত এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে প্রথমে মুক্তির কথাই বলেছিলেন; তার পরে বলেছিলেন স্বাধীনতার কথা।

১৯৮১ সালের ১৭ মে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শেখ হাসিনাকে বলা যায় আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তান। পাশাপাশি তিনি বঙ্গমাতার মতোই দূরদর্শীসম্পন্ন। এরপরই শুরু হয় তার সংগ্রামমুখর পথচলা। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি যুক্ত হন। বারবার তাকে গৃহবন্দিত্ব বরণ করতে হয়েছে। ১৯৯১ সালে সূক্ষ্ম কারচুপি হলে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। মাগুরা ইলেকশনের ক্ষেত্রে তিনি কঠোর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক বিজ্ঞতায় বিএনপির দুর্নীতি, একগুঁয়েমি ও নষ্টামির চিত্র জাতির সামনে তুলে ধরেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির কল্যাণে সারা জীবন অনিবেদিত ছিলেন ।তার বিরু দ্ধে দেশদ্রোহিতা, পাকিস্ত ান ও তার সশস্ত্র বাহিনীর বির দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও পাকিস্তানের পূর্ব অংশকে স্বাধীন করাসহ ১২টি অভিযোগ আনা হয়েছিল তার বির দ্ধে ।

ফাঁসিতে ঝোলানোর সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছিল ।রমনা রেসকোর্সে ১০ জানুয়ারির ৭২-এ ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু "সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার মহাসমাবেশে আবেগাপ্লুত বঙ্গবন্ধু অশ্রু সিক্ত নয়নে বলেন, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যাঁরা বর্বর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন, তাঁদের আত্মার প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই । পুনরায় ভাইয়েরা আমার বলে জনতাকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, লক্ষ মানুষের প্রাণদানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে । আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে ।

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন । বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার প্রতি জানাই সালাম । তোমরা আমার সালাম নাও । আমার বাংলায় আজ এক বিরাট ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছে । ৩০ লক্ষ লোক মারা গেছে । আপনারাই জীবন দিয়েছেন, কষ্ট করেছেন । বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে, খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, এটাই ছিল আমার সাধনা । বাংলার এক কোটি লোক প্রাণভয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল । তাদের খাবার, বাসস্থান দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত । আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী, ভারত সরকার ও ভারতবাসীকে আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই কৃতজ্ঞতা । বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দান ও সহযোগিতা দানের জন্য ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন জনগণকেও আমি ধন্যবাদ জানাই ।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি না পেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ধরে রাখতে পারতাম কি না সন্দেহ ছিল এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও অস্তিত্ব টিকে থাকতো কি না তাতেও সন্দেহ আছে । বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেনে এদেশের দুঃখী মানুষের জন্য । তিনি প্রথমেই রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম ও গভর্নমেন্ট থেকে প্রধানমন্ত্রীনির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করেন । তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষার আলোকে সাড়ে তিন বছরের শাসনকালে বিভিন্ন ফ্রন্টে মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেছেন । সে সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য যা যা করার দরকার তিনি তা করেছেন । কিন্তু দুভার্গ্যজনক রাজাকার ও কিছু ঘাঁপটি মেরে থাকা শত্রু সিরাজ শিকদার ও সিরাজুল আলম, মেজর জলিলসহ কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর বির দ্ধাচরণ করেন । তারপরেও বঙ্গবন্ধু তাঁর কাজে সবসময় অবিচল ছিলেন ।

বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বেশি সাফল্য শুধু দেশ স্বাধীন নয়, স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন এবং ফারাক্কা চুক্তি । পাশাপাশি তিনি জনকল্যাণের কথা ভেবে যখন দেশে একটি মেন মেইড দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন চেষ্টা করেছিলেন বাকশালের আওতায় মানুষের দুঃখ বেদনা লাঘবের । গণতন্ত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অবিচল আস্থা । তিনি পাকশাহী আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান, খলনায়ক জুলফিকর আলী ভুট্টো কারোর কথায়ই কখনো মাথা নতো করেননি । পাকিস্তান কারাগারে তার ফাঁসি হতে পারে জেনেও তিনি অবিচল আস্থায় নির্ভয়ে ছিলেন । এবং যুদ্ধ শেষে আন্তরিকতার সাথে দেশ পরিচালনা করেছেন । অথচ কিছু দুষ্টচক্র বন্ধবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার

মতো নৃশংস ঘটনার অধ্যায় বাঙালি জীবনে ঘটায়। এটি আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক।নূর ল ইসলামের ভাষায় বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু না ছিলেন বামপন্থি, না ছিলেন ডানপন্থি তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব। তিনি কিউবায় পাট রপ্তানি করেন। আবার যুদ্ধাপরাধীদের মধ্যে যারা খুন, ধর্ষণ দাঙ্গা করেছেন তাদের ক্ষমা করেননি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশে ফিরে বাঙালির উন্নয়নের জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী হোক রাষ্ট্র। দেশে ফেরার পূর্বেই ভারতে পৌঁছে তিনি কবে ভারতীয় বাহিনী কত স্বল্প সময়ে এ দেশ থেকে যাবে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। গরীব-দুঃস্থ মানুষের প্রতি ছিল তার অকুণ্ঠ ভালবাসা। গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে হাত দিয়েছিলেন। সরকারি স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পল্লী অঞ্চলে আমানতের সুদের উপর ১% বেশি প্রদান এবং ঋণের সুদের উপর ১% কম প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তেল, গ্যাস উত্তোলনের জন্যে বাপেক্স গঠন করেন। যাতে করে সমতা ভিত্তিক ও ন্যায় নীতি ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায় সে জন্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিলনওয়ালার বদলে দৌহগ্রাম, আঙ্গরপোতা ছিটমহলের ব্যবস্থা করেন। সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্যে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিকল্প নেই। এদিকে তিনি যে বাকশাল গঠন করেছিলেন, তা আসলে দেশের মানুষের ত্বরিত উন্নয়নের জন্যে গঠন করা হয়েছিল। বস্তুত বাকশাল ছিল সাময়িক ব্যবস্থা। কেননা তিনি গণতন্ত্রমনা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ভাবতে পারেননি যে, এরকম ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা ঘটবে। তিনি ভাবতে পারেননি যে, নিজ দেশের সৈনিকদের হাতে তাকে চলে যেতে হবে। আসলে মহামানবরা দেশের কল্যাণে নিবেদিত থাকেন। তারা কখনো তাদের উঁচু মাথা হেট হতে দিতে চান না। তিনি অবিচল নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। ঘাতকেরা তলে তলে সংঘটিত হচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রতি যে নির্মম অবিচার করা হয়েছে তার কোন জুড়ি নেই। এই ধরনের পৈশাচিক আক্রমণ ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে। প্রকৃত বাঙালি কখনো বঙ্গবন্ধুর প্রতি অবিচারকে সমর্থন করেনি, বরং ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়েছে। তিনি ছিলেন পর ধর্মমত সহিষ্ণু ব্যক্তিত্ব। অসাম্প্রদায়িক এই ব্যক্তিত্ব ওআইসি সম্মেলনে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নাস্তিকতাকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। আর তাই তো দাউদ হায়দারকে দেশ থেকে বের করে দেন। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি। সে জন্যই যার যার ধর্ম যথাযথ প্রতিপালনে বিশ্বাসী ছিলেন। যখন কেউ ভাল কাজ করেন তখন যারা ভাল কাজ দেখতে পারেন না তারা পেছনে লাগেন। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫-এর কালোরাত্রিরে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে ঘাতকেরা নৃশংসভাবে খুন করল। আসলে ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে অন্যায়কারীরা দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে অন্যায় করতে পারে। বঙ্গবন্ধুর মত মহীরূহের ছায়ায় দেশের যে উন্নয়ন সংঘটিত হচ্ছিল তা থেকে পিছিয়ে দেয়ার মানসে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। যে সমস্ত দেশি-বিদেশি চক্র এই হত্যাকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল তারা সাময়িকভাবেও রাষ্ট্রের বেশ ক্ষতি করেছিল। অথচ ইচ্ছে করলে তার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র ছিল সেটি যথাসময়ে ফাঁস করলে তার ও তার পরিবারবর্গের করুণ পরিণতি হতো না। জীবনে কখনো মাথা নত করেননি এবং এদেশে স্বল্পকালে স্বকীয়তা দ্বারা শাসন পরিচালনা করেছিলেন। এখন বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতাকারীরা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে উলসিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার মূল শিক্ষা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতাসম্পন্ন মানুষ কিন্তু ধর্মহীন নয়; নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক উন্নয়ন, গ্রামীণ অবকাঠামো বিনির্মাণ, দেশের খনিজসম্পদকে দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করা। বঙ্গবন্ধুর মহান নেতৃত্বে যে স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি, তা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। গত বিয়ালিশ বছরে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজটি যে কোনভাবে হোক বর্তমান সরকারের আমলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্মাণের কাজে অনতিবিলম্বে শুরু করতে হবে। ক্ষুদ্র ঋণের টাকা অন্য খাতে যারা

ফাণ্ড স্থানান্তরিত করে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যে লাগাচ্ছে তাদের আইনের আওতায় আনা হোক। বঙ্গবন্ধুর আরেকটি শিক্ষা ছিল তিনি সকল দলের সহাবস্থানে বিশ্বাস করতেন। এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ইতিহাসের বাঙালির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার কর্মের দেদীপ্যমানতায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

আজ আমরা পলে পলে বঙ্গবন্ধুর অভাব অনুভব করি। তিনি শান্তির জন্য জুলিও কুরি পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাননি। এটি বঙ্গবন্ধুর জন্য নয়, নোবেল কমিটির জন্য লজ্জার। কেননা তার মতো মহতিপ্রাণ ব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান করতে ব্যর্থ হয়েছিল তারা। আজ বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজের জোয়াল বসেছে জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘাড়ে। তিনি পিতার অসমাপ্ত কাজ সুন্দরভাবে পালন করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন স্বাধীন রাষ্ট্র। আর তার সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে চলেছি অর্থনীতির মুক্তির আস্বাদ অনুভব করার জন্য।

বঙ্গবন্ধু ওআইসি সম্মেলনে গিয়েছিলেন, জুলফিকার আলী ভুট্টোকে এ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আশা করেছিলেন পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের যে বিশাল দায়-দেনা আছে তা ভুট্টো আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ভুট্টো কখনো তা করেননি। বরং বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক মৃত্যুর দিন সারারাত সজাগ ছিলেন এবং টেলিফোনে গুপ্তঘাতকদের সাথে যোগাযোগ ছিল বলে পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়। যাকে পাকিস্তানিরা হত্যা করার সাহস পায়নি তাকে কতিপয় বিপদগামী হত্যা করলো এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হতে পারে।

একটি নাবালক রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত বিদেশে বসে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যখন অশালীন কথা বলেন তখন তাকে কুলাঙ্গার ছাড়া কিছুই বলা যায় না। এমনকি তার মা ও বাবা কথা বলার দুঃসাহস দেখাতো না। এটি কেবল আইএসআই (পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা) এর মদদেই সম্ভব।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতি একাকার হয়ে গেছে। একই সূত্র গাথা। দারিদ্রপীড়িত বাংলার জনগণের জন্য তার ছিল দরদী মন। এ দরদ চিরকাল জাগ্রত থাকবে যতদিন বাংলাদেশর অস্তিত্ব টিকে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ও সায়মা ওয়াজেদ পুতুল দুজনেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একজন ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যজন প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করে

বঙ্গবন্ধু বাঙালির ভাগ্যোন্নয়নে সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি কখনো পরোয়া করতেন না, তাঁর নিজের ও পরিবারের ক্ষতি হতে পারে। তাঁর কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল,সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারোর সঙ্গে শত্র তা নয়,। এই মহতী নেতা শান্তির জন্য জুলিও কুরী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। বাঙালি ছিল তাঁর হৃদয়ের মণি। তাদের উন্নয়নের জন্য একের পর এক কর্মসূচি স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রহণ করেছিলেন। চেষ্টা করছিলেন কেবল যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রটিকে পুনর্গঠন নয় বরং বিভিন্ন ফ্রন্টে দীর্ঘমেয়াদি তৎপরতার আওতায় উন্নয়ন করার। আজ স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর বাংলাদেশের যে অগযাত্রা তার মূল ভিত্তিভূমি কিন্তু বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ বেয়ে অগ্রসরমান হচ্ছে। বিবিসি বাংলা সার্ভিস যখন সর্বকালের সেরা বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত করছিলেন সঙ্গতকারণেই বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত হলেন সেরা বাঙালি হিসেবে। এখানেই বঙ্গবন্ধুর জয়। আদর্শিক নির্লোভী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মহতীপ্রাণ ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর পরও জনপ্রিয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের মানুষ স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা ভরে। যে পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা করতে পারেনি, সেখানে কিছু বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দল তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে হত্যা করে।

এই জঘন্য পাপকর্ম করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং বছরের পর বছর ধরে ইনডেমনিটি বিল দ্বারা যারা তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্য সদস্যা ও শিশুপুত্র শেখ রাসেলকে হত্যা করেছিল, তাদের বিচার বন্ধ করে রেখেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবোধকে ধ্বংস করে দিয়ে পাকিস্তানপন্থি চিন্তা চেতনাকে আমদানি করা। আজ পাকিস্তান একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র অথচ বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। কারো কারোর কাছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়া সহ্য হয় না। তাই তো সহিংসতা, নাশকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী ঘটনা ঘটাতে সচেষ্ট রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতে ঘাতকরা থেমে থাকেনি। বরং ২০০৪ সালের একুশ আগস্ট বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই চক্রান্ত সেদিন পরাস্ত হয়েছিল। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর নাতি সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল বলে খবর বেরিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু এদেশের প্রাণভ্রমরা ছিলেন। যারা বাঙালি চিন্তা-চেতনা-মননে বিশ্বাস করে না, তাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর মাহাত্ম্য-ঔদার্য বিষবাষ্পস্বরূপ। তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বাংলাদেশের প্রগতি-শান্তি-আত্মোন্নয়ন চায় না। বরং চায় যেকোনো উপায়ে আইএসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠতে। এটি একটি অসাম্প্রদায়িক শক্তিসম্পন্ন বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়। আজ আমাদের বাঙালি জাতির কাছে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আদর্শ-ন্যায় ও সততার। দুর্ভাগ্য যে, বাঙালি শান্তিপ্রিয়। যারা নরপিশাচ, অন্তরিতায় ভোগেন, তারা দেশকে ঈর্ষান্বিত হয়ে পেছনে ঠেলে দিতে চান। বাঙালি এদের মুখ ও মুখোশ সহসাই উন্মোচন করবেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী মুখোশ পরেও যেদিকে পুতুল নাচাও-এর মতো যখন মানুষ মরছে তখন সুবিধা মতো খোল নলচে পাল্টাচ্ছে। এদেরই পূর্বসূরিদের কেউ কেউ আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বলেছিলেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাত থেকে রক্ষা ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান বাহিনী কাজ করছে। আজ ২০১৫ সালে একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। তবে আশার কথা, বাংলার জনগণ এই চালাক-চতুরদের চেনে। তাদের ঘৃণা করে। দেশের অগ্রগতি ঈর্ষান্বিত হয়ে যারা ক্ষতি করতে চায়, তারা দেশ ও জনগণকে প্রতারিত করছে। কোনো অর্বাচীনের সাধ্য নেই বিদেশে বসে বিদেশি অর্থে চরিত্র হননের প্রয়াস করে নিজের কুকর্ম ঢাকা দিতে চায়। এরা দেশের শত্র , জনগণের শত্র । এদের মিথ্যা বিভ্রান্তির মায়াজাল জনগণ ছিন্ন করছে। বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার অজেয়, অমর কীর্তি এখনো দেদীপ্যমান হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধুর সততা, ন্যায় নিষ্ঠা আমাদের পথ চলতে সহায়তা করে। আমরা সকল অন্যায় অবিচারকে র খে সম্মুখে পানে এগিয়ে যাব। বঙ্গবন্ধুর আত্মার প্রতি আলাহ শান্তি বর্ষণ কর ন। ১৬ কোটি মানুষের হৃদয়ের মণি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন তাঁর স্টেইটম্যান সুলভ আচরণের কারণে। মানুষের হৃদয়ে যাঁর জায়গা, অন্তরের অন্তঃস্থল মঙ্গল যাচনায় যিনি ছিলেন সদা ব্যস্ত তাঁর প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা।

২০০১ সালে নির্বাচনে বিএনপি আঁতাত করে ক্ষমতায় আসে। স্থানে স্থানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সূচনা করে। দ্রব্যমূল্যের দাম অসহনীয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের ঊর্ধ্বগতি দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করে। তারা বিএনপির শাসনকালকে দুঃশাসন বলে অভিহিত করে।

জেএমবির উত্থান ঘটতে থাকে। বিদেশ থেকে অস্ত্র এনে পরিবহনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। দুজন যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হন। সবচেয়ে বড়কথা, এই মহতি নারীকে হত্যার জন্য তস্কর তারেক আর তার দোসররা ২০০৪

সালে গ্রেনেড হামলা করে। এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ও কলঙ্কজনক ঘটনা। তবে আলাহ্র অশেষ রহমতে তিনি বেঁচে যান। এ সময় জঙ্গিদের উত্থান ঘটে। মাঝখানে যখন কেয়ারটেকার সরকার ছিল তারা শেখ হাসিনাকে কারারুদ্ধ করে। জনতার চাপে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

পরবর্তী সময়ে ২০০৮ সালের নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট নিয়ে শেখ হাসিনা নির্বাচিত হয়ে আসেন। আবার শুরু করেন জনকল্যাণে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করা। তিনি মানুষের কল্যাণের কথা ভাবেন, আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা ভাবেন, ভাবেন দেশের অগ্রযাত্রার কথা। এ সময় জননেত্রীর নেতৃত্ব গুণে দেশ এগিয়ে যায়। ২০১৩-১৪ সালে বিএনপি-জামায়াত কেবল নির্বাচন বয়কট করেনি বরং মানুষ হত্যা, বোমাবাজি ও বোবা প্রাণী হত্যাসহ নানা রকম দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ে। বিএনপি-জামায়াতের অপতৎপরতার নেত্রী দেশ ও জাতির কল্যাণ চান না বলে ২০১৪ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অনুরোধ সত্ত্বেও আসেননি। তৃতীয়বারের মতো ইলেকশনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি দেশে-বিদেশে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে পানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন বাই ওমেন; এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড বাই গোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম; ফোর্বস তালিকায় ১০০ জন ক্ষমতাশালী নারীর মধ্যে ৫৯ স্থান অধিকার করেন। বোস্টন ইউনিভার্সিটি, ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব এবারটি ডান্ডিসহ নানা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-অক্ত :প্রাণ এই মহীয়সী নারীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেন। এই মহীয়সী নারী এখন কেবল বাংলাদেশের নয়, বিশ্বায়নের যুগে নিজ কর্মগুণে স্টেটম্যান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন।

আক্ত র্জাতিক মানসম্পন্ন বাংলাদেশী পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি অভ্যক্ত রীণ, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক শাক্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার ওপরও গুরু ত্ব পরিগণিত হচ্ছে।এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কৌশল হিসাবে টিকফা বিবেচিত হতে পারে। বাংলাদেশের কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন সুবিধা পাওয়া যাবে তেমনি রহঃবষষবপঃঁধষ ঢ়ৎড়ঢ়বৎু ৎরমযঃং-এর কারণে অসুবিধায়ও পড়তে পারে। টিকফা চুক্তির ফলে প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যা হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এটি বাংলাদেশের জন্যে উপকার বয়ে আনবে। বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র যেন জিএসপি+ সুবিধা বাড়ানো উচিত।টিকফা চুক্তি যেন বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কোনো ধরনের খারাপ অবস্থার সৃষ্টি না করে, কিংবা খারাপ ফল বয়ে না আনে।

বঙ্গবন্ধু-পরবর্তী ১৯৯৬-২০০১ সালকে বলা যায় আবার মুক্তিকামী ও গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার পর্ব। এ সময় শেখ হাসিনা অত্যক্ত দক্ষতার সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। মুক্তিযুদ্ধের যে মূল উদ্দেশ্য মানুষের আর্থিক মুক্তি সেটিকে তিনি পুনরায় বাক্ত বায়ন করেন। আবার অশাক্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনি শাক্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ নেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি সামাজিক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরু ত্ব দেন।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৯তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে সাহিত্যের ছাত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছিলেন, তিনি অর্থনীতির জটিল তত্ত্ব বোঝেন না; বোঝেন একটি সাদামাটা সত্য কথা, আর তা হচ্ছে দেশের সকলের পেটে যেন ভাত থাকে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের মধ্যেই অক্ত র্নিহিত রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্য। ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশানের ব্যবস্থা করে,যাঁরা পূর্বে আর্থিক কার্যক্রমের সঙ্গে সংশিষ্ট ছিলেন না তাঁদের আওতায় আনার চেষ্টা করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের ফলে ফিন্যান্সিয়াল ডিপেনিংয়ের ক্ষেত্রে দেশের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছে। আর্থিক খাতে অক্ত র্ভুক্তিমূলক কর্মসূচী দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিধারাকে সম্প্রসারিত করেছে। টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের মূল্যমান বেশ কয়েক বছর স্থিতিশীল থাকার

পর গত বছর সামান্য বেড়েছে। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একের পর এক মাইলফলক অর্জন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুষ্ঠু কর্মকা-রে জন্যই আজ পদ্মা সেতুতে নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। সবুজ ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। নারীর ক্ষমতায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন। ইতোমধ্যে পরিবেশ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অর্থায়নে বিভিন্ন নির্দেশনাবলী গ্রহণ করা হয়েছে। সৌরবিদ্যুত উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি যত বেশি প্রসারিত হচ্ছে, তত বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। ২০০৯ সালে সরকার যখন ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন যে পরিমাণ বিদ্যুত উৎপাদিত হতো, এখন তার ৬ গুণ বিদ্যুত উৎপাদিত হচ্ছে। তারপরও বিদ্যুতের উৎপাদন জ্যামিতিক হারে বাড়ানো উচিত।

মার্কেটাইল ব্যাংকসহ যে সমস্ত ব্যাংকে সিএসআরের অর্থ নষ্ট হয়েছে, তা যেন দূরীভূত করা যায়। ছিন্নমূল শিশুদের উন্নয়ন, স্কুল বাংকিংসহ নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। উদ্যোক্তা শ্রেণী গঠনে তাঁর ভূমিকা প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করছে। প্রথাগত অর্থনীতিকে ভেঙ্গে তিনি মানবকল্যাণমুখী অর্থনীতির সূচনা করেছেন। তাঁর এই অর্থনৈতিক কর্মকা- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যা ও সঙ্কট উত্তরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করছে।

নৌপথ উন্নয়ন এবং বন্ধ হওয়া নৌপথ চালুর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া দরকার। নদীর ড্রেজিং করা এবং সেখানে যেসব মাটি জমে, সেগুলো অন্যত্র সরিয়ে আনার ব্যবস্থা থাকার দরকার ছিল। প্রতিবছর দেশ থেকে প্রচুর অর্থ চিকিৎসাজনিত কারণে বিভিন্ন দেশে মেডিকেল ট্যুরিজমের আওতায় বেরিয়ে যাচ্ছে। এ অব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। এজন্য স্বাস্থ্য খাতে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলোকে কাজ করার জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও সহায়তা বাজেটে থাকা দরকার ।

কালো টাকা সাদা করার বিপক্ষে বলেন, এই টাকা সাদা করার ব্যবস্থা না থাকলে দেশ থেকে অর্থ পাচার বেড়ে যাবে এবং ইনফর্মাল সেক্টর অনুৎসাহিত হয়ে পড়বে। কালো টাকা শিল্প উন্নয়ন, অবকাঠামোগত নির্মাণে ব্যয় করা প্রয়োজন। আসলে দেশের অর্থনীতির ৫০ শতাংশ হচ্ছে ইনফর্মাল সেক্টর। এ সেক্টরকে বন্ধ রেখে ফর্মাল সেক্টর চালানো যায় না। সহজ জিনিসটি পণ্ডিতরা কেন যে ঘোলা করেন সেটি বোধগম্য নয়।কুইক রেন্টাল পদ্ধতি সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে ঠিক আছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা হিসেবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ, সৌর বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ, কয়লা ও গ্যাসনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

শেখ হাসিনা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, অসাম্প্রদায়িক নীতির সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন, বাংলাদেশে যে জঙ্গিবাদের ঘাঁটি ছিল তা সমূলে উৎখাতে সচেষ্ট হয়েছেন, জঙ্গিবাদের বিরু দ্ধে জিরো টলারেন্স দেখিয়েছেন। যারা জঙ্গিবাদকে আজ মদদ দিচ্ছে তাদের একটি বড় অংশই বিএনপি-জামায়াত সমর্থক। এদের কেউ কেউ আবার গিরগিটির মতো ভোল পাল্টাচ্ছে। এ অংশটির সঙ্গে খোন্দকার মুশতাকের প্রেতাত্মার একটি মিল রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তলে তলে এরা যেন এক্য হয়ে আছে। নিউ জেএমবি আজ তৈরি হচ্ছে দেশিদের মাঝে যারা বিদেশিদের পঞ্চম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। পুলিশ ও র‌্যাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে নিউ জেএমবিদের অপতৎপরতা নস্যাৎ করতে সচেষ্ট রয়েছে।

আসলে জঙ্গিদের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরু দ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ। কেবল ঐক্যবদ্ধ নয় বিএনপি-জামায়াত ঘরানার ব্যক্তিরা। তাদের সঙ্গে সুশীল সমাজের একটি অংশ যারা অবৈধভাবে বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের নাম করে, তারা অনেকটা বেকুবের মতো প্রশ্ন করেন। এ দলটি এতই সংকীর্ণমনা যে, তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত । যে বিপুল অর্থ পাওয়া যাচ্ছে তার পেছনে

কোনো কোনো ব্যবসায়ীর মদদ আছে, সেটি নিশ্চয়ই গোয়েন্দারা খুঁজে বের করবেন। কেননা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, এক শ্রেণির ব্যবসায়ী তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা করেন আর উগ্রতাকে প্রশ্রয় দেন। যেসব জঙ্গি ধরা পড়ছে তার মধ্যে রয়েছে যেমন শিক্ষিত তেমনি অশিক্ষিত। যত দূর মনে পড়ে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে বলছি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ, তারপর বাণিজ্য অনুষদে হিযবুত তাহরীরের উত্থান।

এদিকে বুয়েটের উপাচার্য যখন জঙ্গিদের সম্পর্কে কথা তুলল তখন দেখলাম সব সরকারের আমলে ঘনিষ্ঠ এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তার বিরুদ্ধে বুয়েটে আন্দোলনে তলে তলে চালিয়ে গেলেন, যেহেতু উপাচার্য অ্যালামনাইদের জন্য জমি দেননি।

পত্রিকার রিপোর্টগুলো ভালো করে বিশেষণ করলেই অনেক অজানা তথ্য সামনে চলে আসে, কারা পুরনো জেএমবি তৈরি করেছে, আবার নিউ জেএমবি কারা করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু সামাজিক, আর্থিক প্রতিরোধও একঘরে করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জঙ্গিবাদে জড়িত বলে রিপোর্ট বেরিয়েছে। ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট চ্যানেল ৭১-এ দেখানো হলো। গোয়েন্দারা যদি একটু কষ্ট করে সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন, ভালো হয়। ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ই বলুন আর কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রেজিস্ট্রার সম্পর্কে যেসব অন্তর্ঘাতমূলক বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, তা রহস্য নয়। নিশ্চয়ই নর্থসাউথ, মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরো বেশি করে গোয়েন্দারা সময়মতো অপরাধীদের ধরবেন। নচেৎ তারা যেভাবে শিক্ষাঙ্গনে গেড়ে বসেছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

দেশ-জাতি-সমাজ ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শেখ হাসিনা নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যবস্থাপনার ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন পেটে-ভাতের রাজনীতির অর্থনীতি। তার নেতৃত্ব গুণে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ শক্তিশালী।

সার্ক একটি অকার্যকর সংস্থা। শেখ হাসিনাই কেবল পারেন বিমসটেককে শক্তিশালী করতে। আর এ বিমসটেকে তিনি যেন শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি রিজিওনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক দেন সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। তার মহৎ উদ্যোগে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিদেশে ট্রেনিং নিতে গিয়ে দেখেছি যে, আমরা অত্যন্ত দ্রুত সবকিছু আয়ত্তে আনতে পারি। এখন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলটি বাস্তবায়ন করা দরকার। বর্ণচোররা যাতে এখানে ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষাবিদরা তাদের নিষ্ঠা দিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন করবেন। আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের কাজ করতে গিয়ে দেখেছি উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে অনেক সুযোগ আছে।

এদিকে বাংলাদেশ যাতে ব্রিকসের সদস্য হতে পারে, সে জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করা উচিত। এশিয়ান ইনফাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকেরও সদস্য হওয়া উচিত।

জননেত্রী শেখ হাসিনার কূটনৈতিক তাৎপর্য হচ্ছে সবার সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্বকরণ। তিনি লুকিং অ্যাট দি ইস্ট নীতিতে বিশ্বাসী। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশানে তার কর্মকাণ্ড হচ্ছে দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। তবে

বাংলাদেশ ব্যাংক এখন ড. আতিউর রহমানের প্রস্থানের পর আমলানির্ভর হয়ে পড়েছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশানের ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ অনেকটা স্থবির। যদিও সরকার বিভিন্নভাবে উদ্যোগ নিচ্ছে।

আমি গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও জননেত্রী চিন্তাধারা বাস্তবায়ন উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে। আশা করবো জননেত্রী এ সরকারি প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত তহবিলের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেবেন। উন্নয়নভোগীরা মূলত গবেষণায় যে উত্তরটি দিয়েছেন সেটি তাৎপর্যমণ্ডিত। শেখ হাসিনা সরকার বিএনএফের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সাহায্য দিয়েছেন। নেত্রীর জন্য গর্বে আমার বুক ভরে গেছে। তিনি তার কর্মপদ্ধতি অনুসারে সহযোগীদের বিভিন্নভাবে কাজ করার সুযোগ দিচ্ছেন। দেশের উন্নয়নে জননেত্রীর দুই ছেলেমেয়ে স্বীয় যোগ্যতা ও মেধা প্রদর্শন করে চলেছেন। ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ডিজিটাল বাংলাদেশ করছেন। আর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল সুন্দরভাবে অটিস্টিকদের জন্য মানব উন্নয়নে কাজ করেছেন। এ ব্যাপারে ভারতের এমটিসি গোবালেওহায়ার এডুকেশন ইন অটিস্টিক্স একটি প্রবন্ধ স্কাইপের মাধ্যমে উপস্থাপন করি। প্রবন্ধটির ব্যাপক সাড়া আসলে আমার নয়, বর্তমান সরকারের কৃতিত্ব। সুযোগ পেলে শিক্ষকরা কিভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য অটিস্টিকের সাহায্য করবেন এ ব্যাপারে একটি দিনব্যাপী কর্মশালা করব। জননেত্রী দেশে এন্টারপ্রেনারশিপ তৈরির জন্য ব্যাপক প্রয়াস নিয়েছেন।

আমরা মনে করি জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আগামী নোবেল প্রাইজ দেওয়া দরকার। এ জন্য এখন থেকেই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। জননেত্রী অহিংসতা, মঙ্গলহিতসাধনকারী, জঙ্গি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব প্রদানকারী। জননেত্রীর একাগ্রতা ও বাংলার মানুষের জন্য সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। তার একাগ্রতায় আজ পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি হচ্ছে। অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান একজন যোগ্য ব্যক্তি। তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।

জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশের উন্নয়নে রোল মডেল দিয়েছেন। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল পূর্ণ করার লক্ষ্যে বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে ভিশন ২০১১ (রূপরেখা-২০২১) বাস্তবায়নে তার একাগ্রতা প্রমাণ করে তিনি দেশের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে কতো গভীরভাবে ভালোবাসেন।

বর্তমানে যোগাযোগব্যবস্থা রেলের ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্প্রসারণ হচ্ছে। তবে নৌপথের প্রসার বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফি বছর ড্রেজিংয়ের অর্থগুলো ঠিকমতো কাজে লাগে না।

আমি একটি প্রস্তাবনা রাখতে চাইছি-যারা প্রান্তিক ও গরিব এমনকি নিু আয়ের গোষ্ঠী তাদের জন্য কমিউনিটি ব্যাংকিং চালু করার ব্যবস্থা করার। কেননা ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য খাতে কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রসার করে নেত্রী গরিব ও প্রান্তিক মানুষের প্রশংসাধন্য হয়েছেন। এটি আরো বেগবান হবে বলে আশা করি।

যারা এ দেশের ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে চলে আসা সামাজিক ব্যবসাকে নিজের বলে দাবি করে পরে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে দাবি করছেন তাদের মোক্ষম জবাব হবে সামাজিক ব্যবসার উপাদানসমূহ: সামাজিক নেটওয়ার্কিং, সামাজিক পুঁজি ও সামাজিক বিনিয়োগের আওতায় আনয়ন করা। ধীরে ধীরে গ্রামীণ অর্থনীতি স্থিতিশীল হচ্ছে।সামাজিক ব্যবসার সরকারি প্রসারে সরকারি সংস্থা বিএনএফকে সংযুক্ত করা যায়। আবার মাইক্রোক্রেডিট আসলে এদেশে চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য। ড. ইউনূস বঙ্গবন্ধুর ভাবনাকে নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন এবং এটি একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে ফরমাল সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ঔদার্যকে কাজে লাগিয়ে অনেকে সুযোগমতো কেটে পড়েছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন মাথা পিছু জিডিপি ছিল ৭০১ দশমিক ১৭ (মার্কিন ডলার-২০০৮) আর ২০১৬ তে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৭২ দশমিক ৮৮ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এক বিস্ময়কর ঘটনা যা ১০ বছর আগেও কল্পনা করা যেত না। সরকার মানবকল্যাণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সরকার যে সাফল্য অর্জন করেছে তার ধারাবাহিকতায় আগামী ২০৩০-এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। অর্থনীতির সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এ সাফল্য ধরে রাখা। অবশ্য সরকারপ্রধান যেভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, মেলবন্ধন ও অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করছেন তা সত্যিকার অর্থে সুষম বণ্টন পদ্ধতি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার চলতি বছরে ৭.১১% হতে পারে। বিশ্ব বাজার ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে সূক্ষ্ম ক্ষুরধার তরবারির উপর দাঁড়িয়ে অনেক দেশের অর্থনীতি। আর সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে সবসময়েই অর্থনীতির নিয়ম হচ্ছে অর্থনীতির সূচকসহ অন্যান্য কারিগরি ও মানবীয় হিসাবগুলো ধারণ করে কিভাবে অর্থনীতিকে এগিয়ে আনা যায় সে জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার রপ্তানিমুখী আয়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কর আদায় ব্যবস্থাপনা যথাযথ না করা গেলেও অপ্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির মাধ্যমে অনেকাংশে বাজেট ঘাটতি মোকাবিলা করা যাচ্ছে। দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর যখন সামাজিক যোগাযোগ তত্ত্বের মাধ্যমে উন্নয়নে ভূমিকা রাখে তখন তা মোট জাতীয় উৎপাদনশীলতায় সংযুক্তি ঘটে। আর অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় যখন সামাজিক যোগাযোগ তত্ত্বটি কাজ করে তখন এটি মানুষের অস্তিত্ব ও বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসাবে হত দরিদ্র ও দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করে থাকে। সামাজিক যোগাযোগ তত্ত্বের কারণেই বর্তমান সরকার আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মকা- পরিচালনা করছেন যার মাধ্যমে মানুষ সঞ্চয় বিনিয়োগে উৎসাহী হয় এবং ভোগ প্রবণতায় তার দক্ষতা ও পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়ে থাকে। আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রসঞ্চয় বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ব্যাংকিং চালুর উদ্যোগ গুরুত্বপূণ।প্রধানমন্ত্রীশেখহাসিনাবলেনযে-

ক্ষুদ্রসঞ্চয়হতেহবেক্ষুদ্রবিনিয়োগএবংকোনসাহায্যেরদারিদ্র্যদূরকরারজন্যক্ষুদ্রসঞ্চয়-দরিদ্র জন্য ঘটবে বিশ্বের ত্যাগ করার মানুষ হিসেবে একটি ব্যাপার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেই **করা যাবে** ।

বাংলাদেশপশ্চিমবঙ্গেরঅনেকবেশী (প্রায় ১.৮১) জনসংখ্যাযামাথাপিছুজিডিপিপ্রভাবিতকরতেপারেআছে।২০১৬ সালেজিডিপি ৭,০৫শতাংশপ্রসারিতহবেআগেরবছরেরতুলনায়।বাংলাদেশেজিডিপিবৃদ্ধিরহার ২০১৬ পর্যন্ত ১৯৯৪ থেকে ৫,৭২ শতাংশগড় ২০১৬ সালে ৭,০৫ শতাংশসবসময়উচ্চএবং ১৯৯৪ সালে ৪.০৮ শতাংশ।১৯৯৪ থেকে ২০১৬ বাংলাদেশেরজিডিপিবৃদ্ধিরহারচিত্রপ্রদর্শনকরাহয়: ১

বাংলাদেশ ১৫০ মিলিয়নমানুষ, যাদের ১৩% মার্কিন ৮ ২ প্রতিদিনেরজাতীয়দারিদ্র্যসীমারনিচেবাসদিয়েবিশ্বেরসবচেয়েঘনবসতিপূর্ণদেশগুলোরএ কটি. কিন্তুবাংলাদেশেরচরমদারিদ্র্যেরহার ২০১৬ সালে ১২.৯ শতাংশেনেমেবিশ্বব্যাংকেরউল্লেখকরেছে।একটি দেশের উন্নয়নের জন্যে বিশেষত দারিদ্র থেকে মুক্তির জন্য বর্তমান একবিংশ শতকের দ্বিতীয় যুগে সামাজিক যোগাযোগ যথেষ্ট মাত্রায় গুর"ত্বপূর্ণ হলেও এটি অলিখিতভাবে হাজার বছর ধরে কেবল বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন দারিদ্র্যের দুষ্টু চক্রে যারা দেশে দেশে কালে কালে যুক্ত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ তত্ত্বটি বহুল প্রচলিত একটি ব্যাপার। সামাজিক যোগাযোগ তত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের ক্ষমতায়ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয়ভাবেই ঘটে থাকে।**শেখহাসিনাবলেন, দরিদ্রদের আত্মসম্মান পুনরুদ্ধার এবং তারা সঞ্চয়ী ছিল বন্ধ করা যাবে"।আমরা গরীব অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে চাই। তারা নিজেদেরকর্মসংস্থানেরসুযোগসৃষ্টিহবে." এলজিআরডিমন্ত্রণালয়দ্বারাদেশে** ৪০.৫২৭ **গ্রাম**কাজ করে থাকে। **শেখ হাসিনা বলেন, ইসলাম নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য করার অনুমতি দেয়না, বরং তাদের অধিকার নিশ্চিত করে এবং তাদের মুক্তির জন্য সুযোগ প্রদান করে "নারীরা তাদের নিজেদের ভবিষ্যত তৈরি করতে হবে. আত্মনির্ভরশীলতা তাদের আত্মবিশ্বাস দিতেহবে." বাংলাদেশ সরকার কোনো সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক সমর্থন করেনা।**

পরিবর্তিত বিশ্বের কারণে প্রাচীনকাল থেকে অলিখিতভাবে চলে আসা সামাজিক গণমাধ্যম/ইন্টারনেট/মোবাইল সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে আর্থিক পরিবেশ জানার জন্যে ইন্টারনেট/ মোবাইল ব্যবস্থাপনা অতি দ্র"ত কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের একটি গ্রামের কথাই ধরা যাক যেখানে পূর্বে যোগাযোগে অনেক বিলম্বিত হতো, এখন মুহূত্বের মধ্যে মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পলকের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করে খবর সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ একজন কৃষক মোবাইলের কল্যাণে শহরে ফোন করে জানতে পারে কি দরে তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হচ্ছে।

অবশ্য সরবরাহজনিত ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতার কারণে অধিকাংশ কৃষক ন্যায্যমূল্য বঞ্চিত হচ্ছে। মাঝখান থেকে মধ্যস্বত্বভোগীরা লাভ করছে। তারপরও ৩০/৪০ বছর আগে কৃষক, মৎস্যজীবী সহ অন্যান্য পেশার লোকদের আগের মত ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না।

স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে অবশ্যই বন্টন ব্যবস্থাকে সুষম ও জনমুখী করার প্রয়োজন রয়েছে। নচেৎ এ ব্যবস্থাপনায় যে ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত হবে প্রকারান্তরে তা বাজার ব্যবস্থাপনার সকল ত্রুটি বিচ্যুতিকে দূর করবে না। বরং তথ্যে এক ধরনের সমন্বয়হীনতা বহাল থাকবে। এ জন্যে অবশ্য সরকার মধ্যস্বত্বভোগীদের দূর করার প্রয়াসও গ্রহণ করেছেন এবং সরাসরি পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থাপনায় জোর দিচ্ছেন।

ধীরে ধীরে গ্রামীণ অর্থনীতি যত শক্তিশালী হচ্ছে তত কিন্তু নানামুখী পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানসমূহ। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা কাজ করে থাকে।

লেইক এবং হাকফেলট (১৯৯৮) সালে মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিক পুঁজি যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে যা নাগরিকদের মধ্যে একটি সম্পর্ক উন্নয়ন করে থাকে, সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধি করে এবং কৌশল হিসাবে রাজনৈতিক উপায় ও প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে সাফল্য দিতে সক্ষম হয়। যেহেতু জননেত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে পেট ভাতে রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী সেহেতু সামাজিক উন্নয়ন, জীবন দর্শনে, মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন, নীতিজ্ঞানতা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াসের ক্ষেত্রে ব্যষ্টিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করছেন– প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুসংগত করার মাধ্যমে।ক্ষুদ্রঋণদরিদ্রসুদেরএকটিবিশালবোঝাফেলেন. তদেরছেড়েতারাকোথায়. সুতরাং, ক্ষুদ্রঋণদারিদ্র্যমোকাবেলাজন্যএকটিসমাধানহতেপারেনা.

''দরিদ্রসবসময়চাপদ্বারাভারগ্রস্তহয়সুদশোধকরা| প্রধানমন্ত্রীশেখহাসিনাআত্মকর্মসংস্থানেরউপরভিত্তিকরেদারিদ্র্যবিমোচনেরতারপিতাবঙ্গবন্ধুশেখমুজিবুররহমানএরধারনাকথাস্মরণকরেবলেনযে'একপরিবার,একটিখামার' এবংআশ্রয়-

বর্তমানসরকারেরস্কিমসেইধারণাগুলোরওপরভিত্তিকরেকরাহয়েছে.তিনিবলেন,

'একপরিবার,একটিখামার'একটিপরিবারউপরভিত্তিকরেছিল|

''আমরাগরীবপরিবারকেশেখাতেহবেএবংতাদেরকিছুটাকাদিতে,আশাতাদেরতাথেকেবেশিআয়করতে. যদি তারা উপার্জন এবং সংরক্ষণ **100**টাকা, সরকার নিয়মিতভাবে তাদের একই পরিমাণ সঙ্গে দুইবছরের জন্য প্রদান করতেহবে.''দারিদ্র্যবিমোচনেবর্তমানসরকারেরপরিকল্পনারকেন্দ্রবিন্দুতেছিল' বাড়াএবংআত্মনির্ভরশীলহয়েসংরক্ষণ' ।

প্রধানমন্ত্রীবলেন.''আমরাসবদরিদ্রপরিবারেরআয়এবংযথেষ্টসংরক্ষণকরুন.

সঞ্চয়যেউৎসাহিতকরারজন্যঅভিপ্রেতছিলকরতেচাই.'' ।

রাজনৈতিক দর্শনই বর্তমানে সামাজিক পুঁজি গড়ে উঠতে সহায়তা প্রদান করছে যা জনমানুষের বহুমুখী দরিদ্রতা থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হচ্ছে। পরিবেশ অবশ্যই সামাজিক উননয়ন, ন্যায়বিচার ও সুষম বন্টন ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে অতি দরিদ্রের সংখ্যা যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে তা বস্তুত সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের পাশাপাশি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পুর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আশার কথা সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে আট ধাপ অবস্থান উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। কমিউনিটি ব্যাংকিং তৃণমূল পর্যায়ে করা গেলে গতিময়তা পাবে।

সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয় সামাজিক বুদ্ধিমত্তা। রিগো (২০১৪) মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাধারণ চলার মত গুণ এবং সমাজের অন্যদের সাথে একীভূতভাবে কর্মসম্পাদন করার ক্ষমতা বোঝার। রিগোর এ বক্তব্য অতিশয় তাৎপর্যমন্ডিত। আমরা যদি মানুষী সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করি তবে দেখব যে,

অগ্রসারমান জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে সামাজিক বুদ্ধিমত্তা একটি অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আসলে যুথবদ্ধভাবে সমাজে বাস করতে গেলে সামাজিক বুদ্ধি অত্যন্ড়প্রয়োজন হয় যা সমাজের নিজের অস্ড়িত্ব টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে থাকে। লিডবিরটর ১৯৯৭ সালে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সামাজিক উদ্যোক্তা উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। তার এ বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। যখন কোন উদ্ভাবনই ঘটে থাকে তখন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এ উদ্ভাবনী শক্তিকে মানুষ যদি তার ও সমাজের উন্নয়ন কর্মকা- পরিচালিত করে তবে তা দেশ ও জাতির জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আবার খারাপ কাজে ব্যবহার করলে তা কিন্তু হিত সাধনের বিপরীত ভিন্নমুখীতা দেয়।

আমরা যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করি পারমাণবিক বোমা উদ্ভাবনের পর নাগাসাকি ও হিরোশিমাকে তা মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার শান্ড়িপূর্ণ পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে জনকল্যাণে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে সামাজিক উদ্যোক্তারা সমাজে দক্ষতা, কার্যকারিতার মাধ্যমে যোগ মূল্য সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

এ দেশে আবহমানকাল থেকে সামাজিক ব্যবসা প্রচলিত ছিল যার মূল ভিত্তি ভূমি ছিল সামাজিক পুঁজি, বিনিয়োগ ও শ্রম। তবে এ ড. মুহম্মদ ইউনূস প্রথমদিকে এটি নিজের উদ্ভাবন বলে দাবি করলেও এক্ষণে সে অবস্থান থেকে সরে এসেছেন বলেছেন এটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে কাজ করছেন। মনে পড়ে ২০১৩ সালে যখন আমি তৃতীয় মাত্রায় বিষয়টি তুলে ধরেছিলাম তখন এদেশের একজন অর্থনীতিবিদ বিষয়টির বিরোধিতা করেছিলেন।

শেখ হাসিনা বর্তমানে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উপর জোর দিচ্ছেন। এটি সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ড় গুর“ত্বপূর্ণ। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে সামাজিক পুঁজিতে রূপান্ড়র ও পাশাপাশি মানব পুঁজি এবং যোগাযোগের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, কর্মদক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিদর্শন করা সম্ভব হয়। উদ্যোক্তাকে অবশ্যই সামাজিক উন্নয়নে জনগণের প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্পমূল্যে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব বাজার ব্যবস্থায় ক্ষমতায়ন, ক্রয়ক্ষমতা এবং সামাজিক উদ্যোক্তা একত্রিতভাবে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনাকে একটি দেশের উন্নয়নে কাজ করে অতি দারিদ্র্য কিংবা দারিদ্র্যের দুষ্টুচক্র থেকে মুক্তি দেয়। এ ক্ষেত্রে মোবাইল কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে অথবা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসাবে পালন করে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আবহমানকাল থেকে চাল সামাজিক যোগাযোগ ও জনগণের ক্ষমাতয়নের একটি তত্ত্ব বা মডেল সচিত্র নিম্নে দেখানো হলোঃ

কমিউনিটি ব্যাংকিং তৃণমূল পর্যায়ে

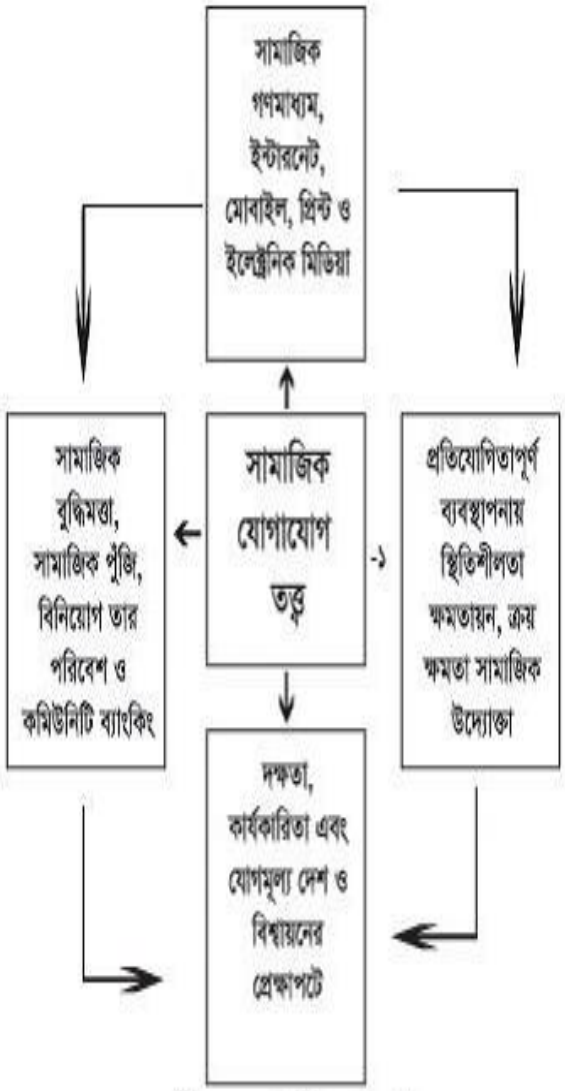

চিত্র নং : ১ সামাজিক যোগাযোগ তত্ত্ব

ক্ষুদ্র সঞ্চয়=ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

চিত্র নং : ১ এ দেখা যায় যে পরিবেশ ও বেশ গুর"ত্ব বহন করে থাকে।

উপরোক্ত মডেলটি দেশে বিদেশে বাস্ড়বে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। টাকার অভাবে কেবল খুলনায় দুটো গ্রামে কেবর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সামাজিক যোগাযোগ তত্ত্ব জনগণের ক্ষমতায়নে কাজ করে থাকে। এটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করার জন্যে সরকার ও বেসরকারি খাত এবং বিদেশি গবেষকদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। পাশাপাশি আশা করা সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক বিশে-ষণকে মানব উন্নয়নে ও আত্মমর্যাদাশীল করে তুলতে হলে আর্থিক অন্ড়র্ভূক্তিকরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রসঞ্চয়বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি ব্যাংকিং চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এ ব্যাপারে সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ক্ষুদ্রসঞ্চয়সামাজিকনেটওয়ার্কিংনেতৃত্বযাসামাজিকউদ্যোগসাহায্যকরে।**প্রকৃতঅর্থে**শেখ হাসিনা **প্রধানতএকা দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে অধিকাংশই কাজ করছেনা বরংতারা ব্যক্তিগত লাভের জন্য শুধুমাত্র সুযোগে তারা গ্রহণ** ।সবাই বিভিন্ন স্তরে আমাদের মহান নেতা শেখ হাসিনার মত দায়িত্ব নিতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক আমলানির্ভর হওয়ায় ফাইন্যান্সিয়্যাল ইনক্লুশান অনেকখানি বন্ধ হয়ে গেছে। এটিকে পুনর্ব জ্জীবিত করা দরকার। সরকারপ্রধান যেহেতুপেটে ভাতের রাজনীতিব্র দর্শনে বিশ্বাসী সে জন্য একটি খামার, একটি বাড়ি প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তবে যারা এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বর্তমানে জড়িত রয়েছেন তারা কিন্তু তেমন কর্মদক্ষতার পরিচয় দেননি। বরং ছিয়ানব্বই সালে ড. শোয়েব আহমেদের নেতৃত্বে অনেক দক্ষভাবেএকটি খামার একটি বাড়ি প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল যা পরবর্তীকালে বিএনপি-জামায়াত সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল। সরকারপ্রধান বহু আশা নিয়ে পল-ী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ এ ব্যাংকটি বর্তমানে অথর্ব হয়ে পড়েছে। একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করে এর মূল্যায়ন করা দরকার।

এদিকে এবারের ব্রিকসের অষ্টম সম্মেলনের পর ১৬ অক্টোবর গোয়ায় বিমসটেক আউটরিচ সম্মেলন হয়। এতে থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। গোয়ার অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ব্রিকস-বিমসটেক-অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা আলোচনা হয়। বিমসটেক মূলত কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক সংস্থা। এক্ষেত্রে দেখা যায় বিমসটেক কখনো গতিময়তা পায়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য-কারিগরি জ্বালানি এবং যোগাযোগ, টেক্সটাইল ও চামড়াসহ বিভিন্ন পর্যায়ে যে সমস্ত উন্নয়নের কথা হচ্ছে তা কিন্তু কার্যকর হচ্ছে না। বরং একধরনের আলসেমিতে ছেয়ে আছে। সম্প্রতি ভিন্ন ভিন্ন কারণে পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রের আপত্তির মুখে সার্ক সম্মেলনটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিমসটেকের গুর ত্ব আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। বিমসটেককে চালিকা শক্তি হিসাবে উন্নয়নের অংশীদারিত্বে নিয়ে আসতে হলে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত যেমন, জাপান, ফিলিপাইন, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তকরণের কথা বিবেচনায় আনা দরকার। বিমসটেকের আউটরিচ সম্মেলনে বিমসটেকের আওতাভুক্ত কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পসমূহ সঠিকভাবে যথা সময়ে সমাধান করা হবে। সন্ত্রাসের বিপক্ষে শক্তিমত্তার সঙ্গে কাজ করার জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান। ব্রিকস ও বিমসটেকের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বাক্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, উন্নয়ন, উদ্ভাবনী শক্তি, পরিবেশগত সমস্যা মোকাবিলার কথা উলেখিত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ পর্যায় থেকে অবশ্য জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসের বিপক্ষে শক্ত অবস্থানের কথা বলেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নের বিষয়টিও সম্মেলনে গুর ত্ব পায়। এদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিকসের সঙ্গে বিমসটেকের গভীর সম্পর্ককে সুসমণ্ডিত করার জন্য তিনটি বিষয় তুলে ধরেনঃ

প্রথমত: তিনি দুইটি আঞ্চলিক সংস্থাকে ভৌত অবকাঠামো এবং উন্নয়নের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের উপর গুরু ত্ব দেন; দ্বিতীয়ত: তিনি দুইটি আঞ্চলিক সংস্থা যাতে পারস্পরিক সহযোগিতা করেন সেদিকে নজর দেয়ার আহ্বান জানান। এ বিষয়ে তার উদাত্ত আহ্বানটি এ দুইটি সংস্থার সাধারণ মানুষের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

তৃতীয়ত: তিনি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর গুরু ত্ব দেন। বিমসটের আওতায় বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে পারে। আসলে বিশ্ব শান্তি, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা শেখ হাসিনা সম্মেলনে ঘোষণা করেন। তিনি পাবলিক প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের উপর গুরু ত্ব দেন। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অবশ্য পাবলিক প্রাইভেটের সঙ্গে বিদেশের উন্নয়নের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন হয়। আসলে একটি সুন্দর, বাসযোগ্য বিশ্ব এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করার শুভ উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান তিনি জানান। বিমসটেক আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে বিজ্ঞান, কারিগরি এবং সৃজনশীল সক্ষমতার উপর গুরু ত্ব দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বর্তমানের বিশ্বায়নে টিকে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়তে পারে। এ অঞ্চলের মানুষের জন্য এখন সুপেয় পানি, পয়নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় সহযোগিতা করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে। ব্রিকস ও বিমসটেক একযোগে কাজ করলে প্রাতিষ্ঠানিকরণ, অঞ্চলগত উন্নয়নের সুবিধা হবে। ব্রিকস যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসার বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের উচিত অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করা। জননেত্রী শেখ হাসিনাই পারেন বিমসটেককে কার্যকরী সংস্থা হিসাবে গড়ে তুলতে। এজন্য শিক্ষা খাতে একটি কোয়ালিটি অ্যাডুকেশন ফ্রেইমওয়ার্ক গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছে। বিশ্ব সরবরাহজনিত শৃংখলের ক্ষেত্রে দুইটি সংস্থা যদি কার্যকরভাবে কাজ করে তাহলে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারে। এজন্য ফ্রি ট্রেড এরিয়া গড়ে তুলতে উতসাহ প্রদান ও সক্ষমতা তৈরি করতে হবে ৬পূর্ব মুখী উন্নয়ন্ন-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে অবশ্যই আঞ্চলিক সংস্থার সম্প্রসারণ ও তা কার্যক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষাকেও আরো সহযোগিতামূলক আবরণে আবদ্ধ করে জনকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। ব্রিকস ও বিমসটেকের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কর্ণধরদের আরো দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং মানব উন্নয়ন প্রত্যয় নিয়ে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। এ সংস্থাগুলোতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ভাল্যু চেইনে কাজ করা দরকার।

আজ পূর্বমুখী উন্নয়নে গতিশীল নেতৃত্বে রয়েছেন শেখ হাসিনা, ভারতে আছেন নরেন্দ্র মোদী, মিয়ানমারে আছেন অং সান সু চি, নেপালে আছেন কেপিশর্মা অলী। জননেত্রী যেভাবে তার নেতৃত্ব গুণে বাংলাদেশকে এগিয়ে দিচ্ছেন তেমনি তিনি চাইলে বিমস্টেক আরো গতিশীলতা পেতে পারে। বিমস্টেকের বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২২% যে অঞ্চলে বসবাস, সেখানে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা তেমন কার্যকর হয়নি।সদস্য সংখ্যাও বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। জাপান, চীন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াকে সংযুক্ত করার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে। আসলে পূর্বমুখী পরিকল্পনার সার্থক রূপ পেতে হলে বিমস্টেক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোগকে ঢেলে সাজাতে হবে। সর্বাগ্রে ধরতে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, কাঠামোগত সংস্কার এবং জ্ঞান গবেষণা, বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সর্বমুখী অথচ কার্যকর শিক্ষার মান উন্নয়ন। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক উচ্চশিক্ষা কাঠামো গঠনে জননেত্রী বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারেন কেননা বঙ্গবন্ধু কন্যা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার মর্যাদা রক্ষায় সবসময়ে, সচেষ্ট রয়েছেন। এরপরই আসে স্বাস্থ্য খাত। এখাতেও প্রচুর সহযোগিতা আবশ্যক। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বিমস্টেক পারস্পরিক সহযোগিতা করতে পারে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে একটি নীরব বিপৰ চলছে। তথ্য ও সেবা কেন্দ্র দেশের প্রায় ৪৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত হয়েছে। ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টেল তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ওয়েব পোর্টেল সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২৪,০০০। মোবাইল ফোন মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি। মোবাইল ব্যবহারকারীদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে নয় কোটি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় আমরা যে সমস্ত কর্মসূচি দেখতে পাচ্ছি তা আসলে বর্তমান সরকারের সাফল্যকে তাতপর্যমণ্ডিত করছে।

বর্তমান যুগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পূর্বতন ভূমিকা কেবল মুদ্রানীতি পরিচালনা, বিনিময় হার নির্ধারণ, লেন্ডার অব দি লাস্ট রিসোর্ট, মার্জিন রিকোয়ারমেন্টের উপর নির্ভর করে পরিচালনা বন্ধ হয়ে গেছে। আধুনিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা পরিচালনা, মূল্যস্ফীতি হ্রাসের পাশাপাশি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন করে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে যে পুঞ্জীভূত দুর্নীতি বিরাজ করছিল, সরকারের প্রয়াস সত্ত্বেও তাতে তেমন সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।এসডিজির যে ১৭টি মূল লক্ষ্য রয়েছে সেগুলো হচ্ছে: দারিদ্র্যের সকল ধরনের পরিসমাপ্তি, ক্ষুধার পরিসমাপ্তি, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, খাদ্য উপাদানের মান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বপূর্ণ কৃষির প্রসারমানতা, স্বাস্থ্য-সেবার উন্নয়ন এবং সব বয়সের মানুষের কল্যাণ সাধন, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সকলের জন্যে সমন্ত জীবনভর শিক্ষার ব্যবস্থা; নারী-পুর ষ সমঅধিকার এবং নারীর ক্ষমতায়ন; পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রাপ্যতা এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা; সকলের জন্যে জ্বালানির প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা

এবং টেকসই পদ্ধতির বাস্তবায়ন; অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক অগ্রগতির টেকসই, বাস্তবসম্মত কর্মসংস্থান পদ্ধতি এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থান; অবকাঠামো তৈরি করা, শিল্পায়নকে প্রসারিত ও টেকসই করা এবং অভিনবত্ব আনয়ন করা; দেশের অভ্যন্তরে অসাম্য দূর করা; টেকসই ভোগপ্রবণতা এবং উতপাদন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; আবহওয়াজনিত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাতক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; সমুদ্র, নদ-নদী এবং জলজ সম্পদের সুস্পষ্ট ব্যবহার যার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব, যাতে করে ইকোব্যবস্থা ঠিক থাকে, বনায়ন ব্যবস্থাপনা করা এবং বন সংরক্ষণ করা; ভূমির সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা; শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা; সকলের জন্যে ন্যায়বিচার ও সমতা বিধান করা; কার্যকর হিসাব রক্ষণ করা এবং সর্বক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা করা, সঠিকভাবে নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে কল্যাণমুখী কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন করা এবং বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। ব্যবসা-প্রশাসনের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ল্যাব তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। মান্ধাতার আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সরে আসতে বর্তমান সরকার প্রয়াস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যারা বাস্তবায়ন করবে তারা যেন সচেতন হয় যাতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে মানুষ থাকে সেজন্যে অবশ্যই সরকার যেমন উদ্যোগী রয়েছে তেমনি বেসরকারি খাতকেও উদ্যোগী হতে হবে। ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ততপরতা দেখাচ্ছেন এবং নির্দেশনা দিচ্ছেন তা বাস্তবায়নে যারা জড়িত তারা কতটুকু আন্তরিক সেটি অবশ্যই যাচাই করে দেখা দরকার। কেননা ব্যবস্থাপনার নিয়ম অনুসারে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট চাইলেই হবে না মাঝারি ও নিম্নপর্যায়ের ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন তাদের অবশ্যই অধিকতর দায়িত্ববান হতে হবে। অবশ্যই সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে ডমেস্টিক ক্রেডিটে রূপান্তরকরণ এবং প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো নির্মাণে শক্তিমত্তার ও প্রয়োজনীয় দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। বৃহত্তর ১৯টি জেলাকে বিভাগে রূপান্তর করতে হবে। জনসংখ্যা ও দুর্নীতি হ্রাস করতে হবে।

জিএসপি ফ্যাসলিটিজ বন্ধ করার পরও বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি, ২০১৪ সালে যে পরিমাণ রপ্তানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে তা ২০০৯ সালে তিনগুণের কাছাকাছি। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিকাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে গড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ করতে হলে ১৫.৬১% ডিউটি প্রদান করতে হয়। অথচ ভিয়েতনাম ৮.৩৮%, ইন্দোনেশিয়া ৬.৩৬%, জার্মানি ১.১৬%, ভারত ২.২৯, তুরস্ক ৩.৫৩%, চীন ৩%, হংকং ১.২৫% দিচ্ছে। এ উচ্চ হারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক শিল্প প্রবেশ করে প্রতিযোগিতার অহেতুক বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের সামনে দুটো ভয়াবহ সংকট রয়েছে। দুটোই প্রকৃতিপ্রদত্ত-একটি হচ্ছে ভূমিকম্প, আরেকটি হচ্ছে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। পরিবেশ বিপর্যয় রোধকল্পে বেশ কিছু জনসচেতনতা তৈরির প্রয়াস গ্রহণ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এজন্য প্রয়োজন ফান্ডিংয়ের। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের আশঙ্কা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তবে এতে গতিময়তা আনতে হলে দেশি-বিদেশি পার্টনারশিপের মাধ্যমে বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনার আওতায় কাজ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে সাম্প্রতিক নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। এজন্য সময় এসেছে বেসরকারি উদ্যোগে মানুষকে সচেতন করার।

এ অঞ্চলে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাগুণে এক ধীমান শক্তি। তিনি শান্তির জন্য কাজ করে চলেছেন। জননেত্রীর কাছে আবেদন থাকবে, শান্তির অন্বেষায় বিমসটেককে জাগ্রত করার প্রয়াস নেয়া এবং অঞ্চলগত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার সম্প্রসারণের পাশাপাশি সন্ত্রাস এবং জঙ্গীবাদ মোকাবেলায় তিনি যে জিরো টলারেন্সের পরিচয় দিয়েছেন তাকে আঞ্চলিক সংস্থার আওতায় আনয়ন করা। কেননা শেখ হাসিনা যথার্থই বৈশ্বিক নেত্রী হিসেবে কাজ করে চলেছেন। তিনি পাকিস্তানের হীন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার রয়েছেন।

বাংলার মাটিতে জঙ্গিদের কোনো স্থান নেই, থাকতে পারে না। মানুষ নয়, যারা নরপিচাস তাদের মধ্যে পাশবিকতা উন্মেষ ঘটেছে তা সমূলে উৎপাটন করাই হচ্ছে একমাত্র আগামী দীনের প্রত্যাশা। আশা করি জননেত্রী শেখ হাসিনা তার বিজ্জোচিত নেতৃত্বগুণে এ সমস্যার সমাধান করবেন। একটি ধর্ম নিরপেক্ষ মুক্তিযুদ্ধ চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হয়ে উঠুক বিশ্ব দরবারে শান্তি-শৃঙ্খলার রোল মডেল। জননেত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় “ পেটে ভাতের রাজনীতির জন্য অর্থনীতির সার্থক বাস্তবায়ন ঘটছে। অর্থ উপদেষ্টা আগামী বাজেট প্রণয়নে আরো মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন আশা করি।

এদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। নেতৃত্বে আছেন অবিসংবাদিত নেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আজ কেবল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নয়, সারা দেশের মানুষের নয়নের মণি। তাকে নোবেল পুরস্কার শান্তির জন্য দিলে নোবেল পুরস্কার কমিটি ধন্য হবে। জননেত্রীর হাত ধরে আওয়ামী লীগ এগিয়ে চলুক ।